সংবাদ

তারিখ 2 JUN 2013
পৃষ্ঠা ৫ কলাম

মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম-২০১২ : বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ

শেখ শাহবাজ রিয়াদ

২০১২ সাল ছিল বাংলাদেশের শিক্ষার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বছর। একটি বছরের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের সম্পূর্ণ নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন এবং সে শিক্ষাক্রমের আলোকে পুস্তক লিখন এবং ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ৩৩ কোটি বই ছাপিয়ে সারাদেশের বিদ্যালয়গুলোতে পৌঁছে দেয়া এবং ১ জানুয়ারি বই পেয়ে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর হাসিমুখে বাড়ি ফেরার দৃশ্য স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে আগে ঘটেনি। বিশ্বের ইতিহাসেও ঘটেছে কিনা সন্দেহ। ২০১০ সাল থেকেই অবশ্য শিক্ষার্থীরা বছরের প্রথম দিন থেকে নতুন বই পেয়ে আসছে। তবে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বই লেখার সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাদের জন্য ছিল এটি একটি কঠিন পরীক্ষা। কেননা এক একটি বিষয়ের শিক্ষাক্রম কমিটির সদস্যদের বয়স, বিষয়ভিত্তিক ও শিক্ষাক্রম প্রণয়নসংক্রান্ত অভিজ্ঞতা, পদমর্যাদা, পেশাগত ব্যস্ততা, কোন্টায় বেঁধে দেয়া স্বল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে অনুকূল ছিল না। তবে যেসব বিষয়ের শিক্ষাক্রম কমিটির সদস্যদের মধ্যে টিমস্পিরিট যত বেশি ছিল তাদের জন্য কাজটি করা অনেকটা স্বস্তিদায়ক ছিল। ঠিক উল্টো অবস্থা ছিল তাদের, যে কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল বেশি কিন্তু অভাব ছিল পারস্পরিক যোগাযোগ, পেশাদারিত্বের। স্বল্প সময়ের মধ্যে বিশাল কর্মযজ্ঞের প্রায় অসম্ভব কাজটি শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়েছে সবার সহযোগিতা বিশেষ করে এনসিটিবি ও এসইএসটিপি প্রকল্পের পরামর্শক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালনের কারণে। তবে এ কথা সবাই জানেন যে, প্রণীত শিক্ষাক্রম যত ভালোই হোক না কেন, তার সফলতা নির্ভর করে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের ওপর। এ ক্ষেত্রে আমাদের অতীত রেকর্ড তত সুখকর নয়। বিভিন্ন কারণে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। আশা করি এবার যে উদ্যোম ও গতিশীলতায় কাজ চলছে তাতে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের পথে সব বাধাগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করার সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সর্বপ্রথম যা প্রয়োজন তা হলো দেশব্যাপী শিক্ষাক্রম বিতরণ কার্যক্রমটি যথাযথভাবে সম্পাদন করা। ইতোমধ্যে বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আশা রাখি অতীতের মতো কাজটি দায়সাড়া দৃষ্টিভঙ্গিতে হবে না। বিতরণ কাজটি সঠিকভাবে করতে পারলেই শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের পথে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়ে যায়। কারণ দেশব্যাপী মাঠ পর্যায়ের শ্রেণী শিক্ষকের কাছে থেকে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের প্রকৃত সমস্যাগুলো জানা ও পাওয়া অনেক সহজ। তবে মাঠ পর্যায়ের শিক্ষকদের কথা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে কোনদিন পৌঁছাবে কিনা তা কেউ জানে না। তবে একটি শিক্ষাক্রম সাধারণত দশ-বার বছর পর্যন্ত বড় ধরনের পরিবর্তন ছাড়া চলমান থাকে তাই বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জগুলোকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গিতে আলাদা করে অগ্রসর হতে হবে। ১৯৯৫ সালে প্রণীত বিগত শিক্ষাক্রম সতের বছর আগের। ২০১২ সালের শিক্ষাক্রমে প্রণয়নে তাই অনেক পরিবর্তন ও পরিমার্জন এসেছে। সাম্প্রতিককালের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও বিষয়বস্তু, যেমন : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা, ক্যারিয়ার শিক্ষা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং, জলবায়ু পরিবর্তন ও আমাদের করণীয়, বয়ঃসন্ধিকাল ও প্রজনন স্বাস্থ্য, নারী উন্নয়ন, নীতিমালা ইত্যাদি শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। মুখস্থ করার পরিবর্তে 'করে শেখা'র ওপর জোর দেয়া হয়েছে। সৃজনশীলতা বিকাশের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধ, সততা, দেশপ্রেম ও নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সর্বোপরি এ স্তরের শিক্ষাকে জীবনের প্রবেশদ্বার হিসেবে বিবেচনা করে কর্মজীবনে প্রবেশে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনের উপযোগী করে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের প্রয়াস চালানো হয়েছে। উপরোক্ত নতুন নতুন বিষয় ও বিষয়বস্তুগুলোর অধিকাংশ মূল্যবোধ ও দক্ষতাসম্পৃক্ত। শিক্ষক এসে বই খুলে নিজে রিডিং পড়ে কিংবা শিক্ষার্থীদের দিয়ে রিডিং পড়িয়ে যেনতেন প্রকারে ক্লাস নিলে উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। নতুন বিষয় ও বিষয়বস্তুগুলো পড়ানোর মতো যোগ্য ও পর্যাপ্ত শিক্ষক আছে কিনা সে বিষয়টি বিবেচনা করা জরুরি। আমাদের মাধ্যমিক স্তরের একটি দীর্ঘকালীন সমস্যা হলো পর্যাপ্ত ও যোগ্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের অভাব। বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক প্যাটার্ন এখনও বিসয় ও পড়াশোনাবান্ধব হয়নি। বিগত দশ-বার বছরে মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থী যত বেড়েছে শিক্ষক সংখ্যা তত বাড়েনি। আবার বেশিরভাগ বিদ্যালয়ে দেখা যায় দুই একটি বিষয়ে প্রয়োজনের চেয়ে শিক্ষক বেশি আছে, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে ন্যূনতম শিক্ষক নেই। এক বিষয়ের শিক্ষক অন্য বিষয় পড়িয়ে যাচ্ছেন দীর্ঘদিন ধরে ইচ্ছার বিরুদ্ধে, বাধ্য হয়ে। কর্তৃপক্ষ এ দিকটিতে একটু বেশি নজর দিয়ে 'বিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষক সমন্বয়'এর কাজটি শুরু করতে পারেন। এ কাজটি শুরু হতে পারে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়গুলো দিয়ে। এতে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে শিক্ষার্থী। কারণ শিক্ষার্থীরা বিষয় শিক্ষককের বাইরে অন্য শিক্ষকের ক্লাসে যেমন মনোযোগী থাকে না, তেমনি উপকৃতও হয় না। আবার যে শিক্ষক তার বিষয়ের বাইরে অন্য বিষয় পড়ান তাতে তার আগ্রহ থাকে না, দায়িত্ববোধ থাকে না। ফলে পেশাদারিত্ব অর্জিত হয় না। নতুন শিক্ষাক্রমের যে বৈশিষ্ট্য তাতে বিষয়টি আরও কঠিন হবে শিক্ষকদের জন্য; কারণ নতুন শিক্ষাক্রমে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য নতুন। তাই স্বল্প মেয়াদে শিক্ষক সমন্বয় করে এবং দীর্ঘমেয়াদে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে কারিকুলাম বাস্তবায়নের পথ প্রশস্ত করতে হবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রচলিত ক্লাস রুটিনও কার্যকর শিখন-শেখানো কার্যক্রমের পক্ষে অনুকূল নয়। এ কথা সত্যি যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে যত বিষয় পড়ানো হয় কোন বিদ্যালয়েই সেই বিষয়গুলোর শিক্ষক নেই। দেখা যায় ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে ক্লাস পেতে যত আগ্রহ, ততই কম আগ্রহ বাংলা ১ম, ২য় পত্র, ধর্ম, কৃষিশিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা, ইতিহাস, ভূগোল, চারুকলাসহ অন্যান্য বিষয়ে। নবম দশম শ্রেণীর শাখাভিত্তিক বিষয়গুলোতে শিক্ষকের অভাব রয়েছে। বিশেষ করে ব্যবসায় শিক্ষা শাখায়। ফলে দেখা যায় ব্যবসায় শিক্ষার একজন শিক্ষককেই সারাবছর নবম ও দশম শ্রেণীর ব্যবসায় শিক্ষার তিনটি বিষয়ের ক্লাস একাই নিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর অন্যান্য বিষয়ের ক্লাসও তাকে নিতে হয়। একথা অবশ্য সব শিক্ষকের ক্ষেত্রে সত্যি। ফলে মাধ্যমিক পর্যায়ের কোন শিক্ষকই কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক হিসেবে নিজেকে তৈরি করতে পারে না। এর প্রভাব পড়ে রুটিন প্রণয়নকালে। রুটিনে পছন্দমতো ক্লাস পেতে শিক্ষকরা এক অশোভন, অন্যায্য প্রতিযোগিতা, তদবির ও গ্রুপিং এ জড়িয়ে পড়েন। কেননা রুটিনে ভালো ও পছন্দমতো ক্লাসের সঙ্গে প্রাইভেট টিউশনি, কোচিং ও সামাজিক মর্যাদা জড়িত। প্রায় সব বিদ্যালয়ে রুটিন নিয়ে দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান দলাদলি ও অসন্তুষ্টি বিরাজমান। ফলে দেখা যায় যে, এ বছর কোন শিক্ষক যে ক্লাস পাচ্ছেন, পরের বছর সে ক্লাস পাচ্ছেন না। প্রধান শিক্ষক বা সহকারী প্রধান শিক্ষকরা ক্লাস রুটিনে ব্যালেন্স করার চেষ্টা করেন। ক্লাস রুটিনে ব্যালেন্স করার নীতিটি হলো পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় ক্লাসের সমন্বয় করা। শিক্ষকগণের প্রত্যক্ষ বিবরণ থেকে জানা যায় গণিত বা ইংরেজি শিক্ষক হয়েও নতুন যোগদানের কারণে বা স্থানীয় না হওয়ার কারণে বা প্রধান-সহকারী প্রধানের কাছের না হওয়ার কারণে তিনি বা তারা নিজস্ব বিষয়ের ক্লাস পাচ্ছেন না। নতুন শিক্ষাক্রমে পূর্বের তিনটি পরীক্ষার পরিবর্তে দুই সেমিস্টারে দুটি পরীক্ষার সিদ্ধান্ত শিক্ষক-শিক্ষার্থীর জন্য ইতিবাচক বলে আমাদের কাছে মনে হয়। কারণ এতে শিক্ষার্থীরা বিশ্রামহীন কোচিং ও পরীক্ষা এবং শিক্ষকরা প্রশ্ন করা ও খাতা দেখার বিরামহীন কর্ম থেকে সামান্য হলেও মুক্তি পাবেন। সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু হওয়ার পর শিক্ষকদের সৃজনশীল চিন্তা-ভাবনার সময় কমেছে। কারণ প্রতিটি বিষয়ে নয়টি উদ্দীপক ও ছত্রিশটি প্রশ্ন করতে গিয়ে শিক্ষকরা হিমশিম খাচ্ছেন। সাধারণত পরীক্ষার ৩-৪ দিন আগে শিক্ষকরা জানতে পান কোন কোন বিষয়ের প্রশ্ন করতে হবে। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে তিন-চারটি বিষয়ে বহুনির্বাচনী প্রশ্নসহ 'মানসম্মত সৃজনশীল প্রশ্ন' করা শিক্ষকদের পক্ষে কতটুকু সম্ভব তা গবেষণার দাবি রাখে। দেশের সেরা, মাঝারি ও পিছিয়ে পড়া বিদ্যালয়গুলোর অভ্যন্তরীণ প্রশ্নগুলো মূল্যায়ন করার সময় এসেছে। আবার প্রচলিত সৃজনশীল প্রশ্নের নামে একই ধরনের প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের চিন্তার বিকাশ ও প্রয়োগে কতটুকু অবদান রাখছে তাও মূল্যায়ন করার সময় এসেছে। পাবলিক পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরপত্র মূল্যায়নে বরাদ্দকৃত সময়টুকু কতটা উত্তম মূল্যায়নবান্ধব তাও বিবেচনা করা দরকার। আশা করা যায়, নতুন শিক্ষাক্রম ও নতুন পাঠ্যপুস্তক আমাদের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের অনেক দূর নিয়ে যাবে যদি এর বাস্তবায়ন পথের চ্যালেঞ্জগুলোকে যথার্থভাবে মোকাবিলা করতে পারি।

[লেখক : সহকারী অধ্যাপক, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ]